সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ জরুরী

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ও পঙ্গুত্ব বরণের মিছিল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেউ হারাচ্ছে একমাত্র স্বজনকে, কেউ হারাচ্ছেন পরিবারের একমাত্র ভরসার অভিভাবককে। আবার পঙ্গুত্ব বরণ কেও শারিরীক প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। কিন্তু কোনমতেই থামানো যাচ্ছে না সড়ক দুর্ঘটনা।

গত রবিবার মেহেরপুরে একটি পরিবারের একমাত্র সন্তান হারাতে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনাতে। একই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন বাবাও। পরিবারটির অবস্থা কেমন যাচ্ছে সেটা সহজেই অনুমেয়। একই দিন পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ৬জন আহত হয়েছেন। জাতীয় পত্রিকাগুলো খবরে জানা গেছে, ওই দিন সারাদেশে আরো ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৭ জন। একদিনের এই পরিসংখ্যান নি:সন্দেহে ভয়াবহ চিত্রের কথায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উপায় কি? কি ভাবে নিরাপদ ভাবনায় থাকবেন পরিবারের লোকজন। পরিবারের একটি সদস্য কোন কাজে বাইরে গেছেন, সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে তাকে বাসায় ফেরত পাবেন কি না এনিয়ে প্রত্যেকেরই এখন দু:শ্চিন্তা। একটি প্রাণ চলে যায়, তার শোক বয়ে বেরাতে হয় পরিবারের সকলকে। পাশাপাশি যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেন তারা পরিবারের বোঝা হয়ে যায়। যা কখনোই সে নিজেকে বোঝাতে পারে, না পারে অন্য কাউকে। শারিরীক অক্ষমতা কতটা অসহায় করে তোলে একমাত্র তিনিই বোঝেন যিনি এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন।

এর থেকে পরিত্রানের উপায় কি? আমরা কি একটি নিরাপদ সড়ক পেতে পারি না। নিরাপদ সড়ক পেতে যে সকল ক্ষেত্রগুলোতে ভুমিকা রাখা দরকার আমরা কি সেগুলো করতে ব্যার্থ হচ্ছি। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং আমরা (জনগণ) যার যার অবস্থান থেকে নিরাপদ সড়কের কথা একটি বারও ভাববো না।

প্রত্যেকের নিজ অবস্থান থেকে যদি ভাবনার একটি জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয় অবশ্যই এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভভ হবে। সড়কে অনিবন্ধিত মোটরযান, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো থেকে বিরত রাখা এবং গাড়ি চালক ও পথচারী সকলের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করাতে পারলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে হবে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ

প্রশাসনকে। পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহিৃত করে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং পেশা

বাংলাদেশের চাকুরীর বাজার খুবই নাজুক অবস্থায় আছে, যেখানে ৪৭% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সারা দেশে ২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকার আছেন।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত “বাংলাদেশ স্কিলস ফর টুমরোস জবস” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের কলেজগুলো থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ৭০ শতাংশ বেকার থাকে। যেখানে পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরি হয় না, সেখানে বিকল্প পেশা হিসাবে সম্মানজনক অবস্থায় আছে ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্তপেশা।

ফ্রিল্যান্সিং খাতে বাংলাদেশ বেশ ভাল অবস্থানে আছে, বিশ্বে বাংলাদেশের দক্ষ পেশাদারদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে শত কোটি টাকার। হিসেব মতে বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সার আছে ৫ লক্ষাধিক।

ফ্রিল্যান্সিং কি?
ফ্রিল্যান্সিং মূলত একটি পেশার ধরণ। আমরা সাধারণত মনে করি দুই ধরণের পেশা, চাকুরী বা ব্যবসা। কিন্তু আরেক ধরণের পেশা আছে, যার নাম আমাদের জানা ছিল না, সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তা পাওয়া পেশা। যেমন ইমারত নির্মাণকর্মী বা রাজমিস্ত্রির পেশাকে আপনি কি বলবেন? চাকুরী নাকি ব্যবসা? একই ভাবে রিক্সাচালক, ইলেক্ট্রিশিয়ান, নাপিত, ধোপা। যারা প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ করে এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সাংবাদিক, ঠিকাদার ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং হল কোন প্রতিষ্ঠানে পার্মানেন্ট চুক্তিবদ্ধ না হয়ে বরং প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ করা। ফ্রিল্যান্সিং করে আসছে মানুষ শত বছর ধরে। একটি রিক্সাচালকও ফ্রিল্যান্সার বা মুক্তপেশাজীবী। যাদের কাজের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা হলে চালাবে,

ইচ্ছা না হলে চালাবে না।

ফ্রিল্যান্সাররা মূলত কোন একটি কাজের উপরে বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে এবং এদেরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাসিক বেতন দিয়ে রাখা সম্ভব নয় বা কেউ রাখে না। যেমন নাপিত বা ডাক্তার বা উকিল, নাপিতকে বেতন দিয়ে না রেখে যখন লাগবে তাকে কাজে লাগানো এবং সেই মোতাবেক পরিশোধ করা ভাল।

ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের পরিমানও বেশি। যেমন মেহেরপুরের একটি অটোরিক্সা চালক কমপক্ষে ২০-৩০ হাজার টাকা মাসিক আয় করেন, যেটা তাঁর যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক বেতনের থেকে কয়েক গুণ বেশি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলপার বা ঠিকাদারের কথা নাই বা বললাম।

তাহলে আউটসোর্সিং কি?
মনে করেন আপনাকে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরে যেতে হবে, নিজের পরিবহন নাই। আপনি রহিম নামের একজন রিক্সাচালককে ভাড়া করলেন। এখানে রহিম হল ফ্রিল্যান্সার, আর আপনার যেহেতু গাড়ি নাই, আপনি রহিমের সার্ভিসটি আউটসোর্স করলেন। মানে ক্লাইন্ট করে আউটসোর্সিং আর ফ্রিল্যান্সার করে ফ্রিল্যান্সিং।

ফ্রিল্যান্সার হতে কি কি লাগে?
ফ্রিল্যান্সারদের মূল বিনিয়োগ হচ্ছে তাঁদের দক্ষতা। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ওয়েব ডেভেলপার বা গ্রাফিক ডিজাইনার বা মার্কেটিং এক্সপার্ট হতে হলে আপনাকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করা পর্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। কাজ বুঝার বা কাজ করার মত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ফ্রিল্যান্সার হওয়া যেমন কঠিন, তেমন একজন সফল ফ্রিল্যান্সারের আয়ও কম নয়। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্যশীল হওয়া, নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া, শেখার ইচ্ছা প্রবল থাকা।

ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে শিখবেন?
আমি মূলত অনলাইন প্রোফেশনাল হওয়া বা অনলাইনের কাজ গুলোর কথাই বলছি। কোন ভাবে ভেবে নেবেন না আমরা অনলাইনে কাজ করি, অনলাইন হল আমাদের শুধুই কাজ পাওয়ার মাধ্যম মাত্র।

মনে করেন আপনি একটি ইকমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি টি-শার্টের অর্ডার দিলেন, ওনারা আপনাকে প্রোডাক্ট সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল। এখানে ইকমার্স অনলাইনের মাধ্যমে একটি অর্ডার বা ক্লাইন্ট পেল, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক। আমরাও অনলাইনের

মধ্যে কাজ পায়, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক ভাবেই করতে হয়।

আগে আপনি ঠিক করুন আপনার কি ধরণের কাজ করতে ভাল লাগে। যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, এইচআরএম ইত্যাদি, প্রয়োজনের গুগলে সার্চ করে দেখে নিন কি কি কাজ অনলাইনে পাওয়া যায়। তার উপরে ভিত্তি করে আপনি স্থির করুন আপনি কোন কাজে ভাল বা আপনার জন্য কোন কাজটা ভাল হবে।

সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বা সফল ফ্রিল্যান্সারের সাথে আলাপ করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয় নিয়ে ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করুন। অনেক ইউটিউব চ্যানেল পাবেন যারা টিউটোরিয়াল দিচ্ছে বা অনেক ওয়েবসাইট আছে যারা অনলাইন কোর্স দিচ্ছে। যেমন ইশিখন, টেন মিনিট স্কুল ইত্যাদি।

মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয় এবং আমঝুপিতে অল্টারনেটিভ স্কুল নামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয়। যারা ঢাকাতে আছেন বা অন্য জেলাতে আছেন খোঁজ নিয়ে দেখুন উক্ত এলাকাতে ট্রেনিং দেয় এমন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, না থাকলে অনলাইন কোর্স করুন।

যেহেতু অনেক কিছু শিখতে হয় আমি ব্যাক্তিগত ভাবে কোন এক্সপার্ট বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথায় বলব। সঠিক দিক নির্দেশনা, মোটিভেশন এবং শাসন পাবেন। আর নতুনদের জন্য শুধু অনলাইন থেকে শিখতে বেশ কঠিন হতে পারে।

কাজ শিখে কাজ পাবেন কোথায়?
অনলাইনে এই জাতীয় কাজের অনেকগুলো ওয়েবসাইট বা মার্কেটপ্লেস আছে। যেখানে যে ক্লাইন্টের বা কোম্পানির কাজ আউটসোর্স করা লাগে, তাঁরা মার্কেটপ্লেস গুলোতে জব পোস্ট করে রেখে দেন এবং ফ্রিল্যান্সাররা উক্ত জবে এপ্লিকেশন করেন।

ক্লাইন্টের পছন্দ হলে ক্লাইন্ট আপনাকে হায়ার করবেন। কাজ করাবেন এবং উক্ত মার্কেটপ্লেসেই আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা বা ডলার দিয়ে দেবেন।

উক্ত টাকা বা ডলার আপনি বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংকে উত্তোলন করতে পারবেন, আপনার নিজের ক্রেডিট কার্ড বা পেপ্যাল থাকা বাধ্যতামূলক না। আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার ডট কম, ফাইবার, পিপল পার আওয়ার, গুরু, বাংলাদেশী বিল্যান্সার জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস

গুলোর অন্যতম।

আমি কেন ফ্রিল্যান্সিং পেশা বেছে নিলাম?
আমার ছোটবেলা থেকে আইটির প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল। পারিবারিক চাপে বিবিএ এবং এমবিএ করলেও আইটিতে কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার।

২০০৯ সালের ঢাকা থাকাকালীন সময়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। ফ্রিল্যান্সিং ভাল লাগায়, কর্পোরেট চাকুরী ছেড়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং-এই মন দেই, পরে ২০১০ সালে ঢাকা থেকে মেহেরপুরে চলে আসি। ফ্রিল্যান্সিং-এ স্বাধীনতা, স্বাভাবিক চাকুরীর থেকে বেশি আয়ের সুবিধা, নতুন কিছু করার সুবিধা, বিদেশি ক্লাইন্টদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কারণে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নেই।

ফ্রিল্যান্সিং-এ মেহেরপুর
পার্শ্ববর্তী জেলার থেকে মেহেরপুরের ফ্রিল্যান্সিং খাতটি খুবই নাজুক অবস্থানে আছে। আপওয়ার্ক মার্কেটপ্লেসে সার্চ করে দেখা যায়, ১০২ জন নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার আছে, যার মধ্যে ১৭ জন ফ্রিল্যান্সার আয় করতে পেরেছে, ৬-৭ জন ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

ফ্রিল্যান্সার ডট কমে সার্চ করে দেখা যায় ৪৯৫ জন (কম-বেশি হতে পারে) ফ্রিল্যান্সার হিসাবে নিবন্ধন করেছেন কিন্তু আয় করতে পেরেছেন মাত্র ৩২ জন। যার মধ্যে ৭-৮ জন ক্যারিয়ার হিসাবে ফ্রিল্যান্সিংকে বেছে নিয়েছেন।

যেখানে অন্য পেশার থেকে স্বাধীনতা বেশি, চাকুরীজীবী বা ছাত্র বা গৃহিণীরাও ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, এবং মেহেরপুরে যেহেতু পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র নাই, সেখানে এই পরিসংখ্যান কোন ভাবেই আশার আলো দেখায় না। বাংলাদেশে অনেক জেলায় আছে যারা এই সুযোগ গুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিচ্ছেন, আয়ও করছেন বৈদেশিক মুদ্রা। মেহেরপুরে এই সম্ভাবনাময় খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

লেখকঃ প্রধান নির্বাহী, ইউনিক সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি-বাংলাদেশ

ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে হবে

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় জেলায় এবছর ব্যারেল চিমনির ইটভাটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ফিক্সড চিমনিগুলোতে কয়লার পরিবর্তে জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। আর এই কাঠ সংগ্রহ করতে উজাড় হচ্ছে বন জঙ্গল, কাটা হচ্ছে গাছপালা। ফলে পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ৬ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, অন্য যে কোন আইনে যাই বলা থাক না কেন কোনভাবেই ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো যাবে না। এই ধারা লঙ্ঘন করলে তিন বছরের জেল অথবা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা এবং উভয়দন্ডও হতে পারে।

এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে ইটভাটা মালিকরা দেদারছে কাঠ পোড়াছে। যার পরিমাণ হিসেবের বাইরে। এভাবে চলতে থাকলে বন উজাড় হবে। পরিবেশ বিপন্ন হবে।

ব্যারেল চিমনির ইটভাটা গুলোকে যেমনভাবে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে বন্ধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উচিৎ হবে একই ভাবে ইটভাটায় কাঠ যাতে না পোড়ানো হয় সেক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা। তা না হলে একই ঘটনায় দুই নীতি মানার মত অবস্থা তৈরি হবে।

এতে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারাবে। জেলা প্রশাসন পরিবেশ বিপন্নের হাত থেকে এলাকাকে মুক্ত করবে এমনটাই প্রত্যাশা করি।

বিতর্কিত হয়ে উঠছে-

মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই

গৌরব গাঁথা মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বর্ণ উজ্বল ইতিহাস আমাদের অহংকার। দেশের এই স্বাধীনতা অর্জনে যারা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন আজো যাচাই-বাছাই নামক হয়রানীর আর্বতে ঘুরপাক খাচ্ছে। বার বার এই অসম্মান জনক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হচ্ছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে।

রাজনৈতিক কারনে দেশে অসংখ্যবার মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়নে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পূনঃ পূনঃ যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। জানা যায়, ১৯৮৭- সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কোন কোন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রায় ৭-৮ বার যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১৯৮৭-৯৪ সালে ২ বার তালিকা প্রণয়নের সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম তথ্য প্রমানাদি দিতে প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বৃহৎ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাপক যাচাই-বাছাই ও মুক্তিযোদ্ধা তালিকা করা শুরু হয়।

দীর্ঘদিন ধরে পর্যায়ে-পর্যায়ে এবং স্তরে- স্তরে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলে। প্রথম পর্যায়ে কারো সর্ম্পকে নূন্যতম অভিযোগ জানালে পরবর্তী পর্যায়ে পূনরায় তার যাচাই-বাছাই হয়েছে। কয়েক পর্যায়ে যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা ভিত্তিক খচড়া তালিকা প্রণীত হয়েছে। খসড়া তালিকার উপর চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই শেষে তালিকাটি মুক্তিবার্তা পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

তালিকা প্রকাশের পরে কারো সর্ম্পকে কোন অভিযোগ আনিত হলে তা পূনঃ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। অতঃপর চূড়ান্ত তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে লাল মুক্তিবার্তা নামে, যা ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়ে সমাদৃত হয়েছে, এবং চলমান আছে।

মুক্তিযোদ্ধারা জানান, এছাড়াও লাল বই-তে অর্ন্তভূক্ত থাকা মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৯৮-২০০০ সালে যখন কল্যান ট্রাস্টের ভাতার জন্যে আবেদন করেছিলেন, তখন নীতিমালা অনুযায়ী স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক তদন্ত এবং যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। এখানেই শেষ নয় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে একই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পূনরায় যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি করা হয়।

২০০২ সালে সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে গঠিত “যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি” আবারো যাচাই-বাছাই করেন।।

একজন সাবেক কমান্ডার জানালেন, লাল মুক্তিবার্তাভূক্ত এসকল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা সরকারী চাকুরী করেছেন, তাদেরকে পৃথকভাবে আরো দুইবার যাচাই-বাছাই হতে হয়েছে। প্রথমতঃ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশকালীন, দ্বিতীয়তঃ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে চাকুরীর সময়কাল ১ বছর বৃদ্ধিকালীন।

এছাড়া ২০০৫ সালে যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তালিকায় (গেজেট) অর্ন্তভূক্ত হয়েছে, তাদেরকেও যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই হয়েই তালিকাভূক্ত হতে হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি উপযুক্ত তথ্য- প্রমানাদি পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করেছেন। এতো কিছুর পরেও থেমে থাকেনি মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই।

২০১৬-১৭ সালে অনলাইনে নতুন আবেদনকারীদের পাশাপাশি পূর্ব তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দিতে হয়েছিল নিজের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমানাদি।

এ বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জানান, নতুন আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে তথাকথিত অভিযোগের দোহাই দিয়ে সেই সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কেন? যারা ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে পূনঃ পূনঃ যাচাই-বাছাই শেষে দীর্ঘকাল যাবৎ একাধিক তালিকাভূক্ত আছেন।

সচেতন মুক্তিযোদ্ধা মহল আরো জানান, বহুদিন ধরেই কিছু প্রতিহিংসা পরায়ন মানুষ সুযোগ পেলেই কারো না কারো সর্ম্পকে মনগড়া অভিযোগ দিয়ে আসছে। আর এই প্রবণতা দেশের মধ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সব চেয়ে বেশী বলে জানা যায়। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও ব্যাক্তিগত রেষারেষি, দলাদলি, শক্রতা এবং প্রতিহিংসা বশতঃ এসব অভিযোগ হয়ে আসছে। মনগড়া এসকল অভিযোগের স্বপক্ষে থাকে না কোন তথ্য -প্রমান কিংবা ব্যাখ্যা।

নীতিমালা মোতাবেক এসব অভিযোগের গ্রহনযোগ্যতা না থাকা স্বত্বেও একেক সময় একেক ধরনের প্রভাবশালীর প্রভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা দাবী করেন কর্তৃপক্ষগণ যদি ভিত্তিহীন ও তথাকথিত এসব অভিযোগকে আমলে নেওয়া বন্ধ না করেন, তবে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হতেই থাকবে এবং যুগ যুগ

ধরে চলতেই থাকবে যাচাই-বাছাই। বির্তকিত থেকে আরো বির্তকিত হয়ে উঠবে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম।

লেখকঃ মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক

গাংনীতে ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে বিরোধ নিস্পত্তি হওয়া দরকার

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি নিয়ে নেতা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের দানা বেধেছে। সেই ক্ষোভ থেকে জেলার শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে কটুক্তি সহ তার কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা রকম কর্মসূচী থাকতেই পারে।

পদবঞ্চিত হয়ে দলের শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে এ ধরনের কর্মসূচি কতটুকু রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে তা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত। রাজ পথে এ ধরণের আন্দোলনের পূর্বে শীর্ষ নেতাদের সাথে দফায় দফায় সংলাপ ও সমোঝতার একটি পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজন ছিলো।

অপর দিকে উপজেলার মত একটি ইউনিটের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে জেলার শীর্ষ নেতাদেরও সাংগঠনিক নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিলো।

মন গড়া বা নিজস্ব অনুগতদের কমিটিতে দায়িত্ব দিয়ে সাংগঠনিক ভাবে ব্যার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। যা তেকে কেবল দলীয় বিভেদ, কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে। ফলে দলকে সুসংগঠিত করতে হলে অবশ্যই বিষয় গুলো কে গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দিতে হবে। গাংনীতে ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তি করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয় ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকাগুলো দিয়ে মাদক প্রবেশ করছে। সেই মাদক ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। কখনো কখনো ছোট ব্যবসায়ীরা ধরা পড়ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে। কিন্তু মূল মদদদাতারা থাকছেন ধরা ছোয়ার বাইরে।

গতকাল মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রধান সংবাদ ছিল মাদক নিয়ে। একটি এলাকার মাদকের চিত্র নিয়ে সংবাদটি নজরে পড়ে। এর সাথে জড়িত রয়েছে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের এক নেতাও। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি মাদক পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে।

ইতিমধ্যে কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুলপরিমান মাদক দ্রব্য উদ্ধারসহ বেশ কয়েকজন পাচারকারী ও ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন। কিন্তু যাদের ছত্রছায়ায় এই মাদকের ব্যবসা চলছে তারা ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে সমাজে আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার মারাত্মক অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনার বাস্তবায়ন করতে হলে আইনের সমান প্রয়োগ ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে সমাজের কল্যাণে মাদক নির্মূলে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। তালিকাভূক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের গেপ্তারে অভিযান জোরদার করতে হবে। মাদক ব্যবসায় যারা মদদ দিচ্ছেন তাদের খুটি উপড়াতে হবে। তবেই মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। মদদদাতাদের বাইরে রেখে চুনোপুটিদের ধরে মাদক নিয়ন্ত্রণ কখনোই সম্ভভ না।

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত

বারি ৩৩ একটি আশাবাদি সংবাদ

ছত্রাক জনিত রোগ ব্লাষ্ট। গত চার বছর ধরে মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬ জেলার চাষীদের নাজেহাল করে তুলেছে। ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত দেশে ব্লাস্ট রোগ সনাক্ত হয়। সে বছর মাঠের পর মাঠ গম পুড়িয়ে নষ্ট করতে চাষীদের। সরকারিভাবেই মেহেরপুরের দুটি খামারের বীজ গমের ক্ষেতও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পরের বছর মেহেরপুরসহ ৬টি জেলায় গমের চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তারপরও কিছু কৃষক গমের চাষ করাতে পুনরায় গমে ব্লাস্ট আক্রন্ত হয়। পরের বছরও কৃষি বিভাগ চাষীদের গম চাষে নিরুৎসাহীত করে। তবুও কৃষকরা তাদের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য শষ্য হিসেবে গম চাষ থেকে বিরত থাকতে পারেননি।

২০১৬ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের ব্লাস্ট আক্রান্ত হলেও অনেক পুরাতন এই রোগটি। ১৯৮৫ সালের প্রথম ব্রাজিলে গমের এই রোগটি সনাক্ত হয়। পরে ব্রাজিলসহ বেশ কয়েকটি দেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

গমে ব্লাষ্ট আক্রান্ত হলে ফলন হ্রাস হয় এবং যেটুকু থাকে তার স্বাদ তিতা লাগে। আক্রান্ত গমের বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চলতি মৌসুমে এখনো ব্লাস্ট রোগ নির্নয়ের সময় হয়ে উঠেনি। গমের শীষ বের হলে সাধারণত এ্ই রোগ আক্রমণ করে থাকে।

মেহেরপুরকে ব্লাস্টের হটস্পট চিহিৃত করে তিন বছর ধরে ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক গবেষনা চালানো হচ্ছে। ইতি মধ্যে বারি ৩৩ নামের একটি জাত গবেষণার মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যা খুবই আশাবাদি সংবাদ।

এই জাতটির মাধ্যমে কৃষকরা ব্লাস্ট প্রতিরোধী একটি জাত পাবেন এটা অবশ্যই কামনা করি। একই সঙ্গে সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে চাষীদের অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সঠিক মাত্রায় কিটনাশক প্রয়োগের ব্যবহারিক বিষয়গুলো হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধে কৃষি বিভাগের পাশাপাশি কৃষকরাও ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

- সম্পাদকীয়